সত্তর দশকের কবিতা

বিমল গুহ

স্বাধীনতা-যুদ্ধ বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। স্বাধীনতার জন্য বাঙালিদের এই আন্দোলন ছিলো - মূলতঃ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। উনিশশ' বাহান্ন সালে রাষ্ট্রভাষার জন্য সংঘটিত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমাদের কবিতার নতুন বলয় সূচিত হয়। কবিতার আধুনিকতা বিষয়ে সংঘটিত বিষয় ও আঙ্গিকের পাল াবদল- পঞ্চাশের দশকে বিপ্লবের ধারায় উজ্জীবিত কবিদের হাতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। ষাটের কবিরা সেই ধার াকে সমৃদ্ধ করেছেন, সামাজিক অঙ্গীকারে তাঁরা কবিতায় আরো সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, ১৯৭১-রে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সত্তর দশকের কবিতায় যুক্ত করলো আর এক নতুন মাত্রা। কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন না এলেও - বিষয়ের ক্ষেত্রে কবিরা হয়ে ওঠেন অধিক রাজনীতি সচেতন।

মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোতে ওই অঞ্চলের শিল্পী সাহিত্যিকদের শিল্পচর্চার অবকাশ খুব কমই ছিলো। তখন একম াত্র মুক্তিযুদ্ধই ছিলো আমাদের জন্য মহৎ শিল্পকর্ম। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সেই ঐতিহাসিক ভাষণকে অমর কবিতা আখ্যা দিয়ে কবি লিখলেন-'গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি।' সেই দিনগুলোতে জাতির জনকের সেই ভাষণই ছিলো আমাদের মহান কবিতা - আর স্বাধীন বাংলাদেশ-ই যেন প্রকাশিতব্য মহাকাব্য।

স্বাধীনতার পর বাঁধ ভাঙা জোয়ার এলো আমাদের সাহিত্যে। এক্ষেত্রে কবিতা নিলো অগ্রণী ভূমিকা। বাংলা কাব্যাঙ্গনে এলেন বিপুল সংখ্যক কবি। একসাথে এতো কবির সমাবেশ আর কোন দশকে হয়নি। বাংলাদেশের তখনকার বিভিন্ন পত্রিকার সাহিত্য পাতায়, লিটল ম্যাগাজিনে ৭০-৮০ জন নতুন কবির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে নাসির আহমেদ সম্পাদিত 'এক দশকের নির্বাচিত কবিতা'য় ৩৯ জন কবিকে সত্তর দশকের উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে সংকলনভুক্ত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যেও কেউ কেউ পরবর্তীতে কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেননি। শেষাবধি ৩০-৩৫ জন কবি তাঁদের উজ্জল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন আমাদের কবিতায়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় রাজনীতি সচেতনতা ও প্রতিবাদী কণ্ঠের ধারা সত্তর দশকেরই উচচারণ। পরবর্তীকালে তা আরো ব্যাপকতা পেয়েছে, কবিতায় এসেছে প্রতিবাদের জোয়ার। সত্তরের দশকের সামজিক অবক্ষয়-ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক মূল্যবোধের অধোগতি সেই সময়ের কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো। সত্তর দশকের নবীন কবি সম্প্রদায় এবং অগ্রজ কবিরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন একত্রে। কবিতায় তাঁরা গণমানুষের কথা বলেছেন - গণমানুষের ভিতরে গিয়ে মিশেছেন। রাজনীতির মতো কবিতাও বিপুল সংখ্যক মানুষের উচচারণ হয়ে উঠলো। রাজনৈতিক নেতাদের মতো কবিদের পরিচিতিও বৃদ্ধি পেলো বাংলার মানুষের কাছে।

সত্তর দশকের কবিরা দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে মানুষের সপক্ষে সাহসী শব্দাবলী উচচারণ করেছেন। তাঁদের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে সত্তরের কবিদেরকে তিনটি ধারায় চিহ্নিত করা যায় ঃ ১. সংগ্রামী চেতনা ও আশাবাদ যাঁদের কবিতায় বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাঁরা হলেন - আতাহার খান (১৯৪৯), আবিদ আনোয়ার (৫০), রবীন্দ্র গোপ

(৫১), শিহাব সরকার (৫২), ফাক মাহমুদ (৫২), আবু করিম (৫৩), দ্র মুহম্মদ শাহিদুল্লাহ (৫৬), জাহিদ হায়দার (৫৬), মোহন রায়হান (৫৬), কামাল চৌধুরী (৫৭), শিশির দত্ত (৫৯) প্রমুখ।
২. যাঁদের কবিতায় রাজনীতি ও প্রেম সমান্তরাল অবস্থানে থেকে সামাজিক অঙ্গিকারের বাণী উচচারিত হয়েছে, তাঁরা হলেন - স্বপন দত্ত (১৯৪৮), ময়ুখ চৌধুরী (৫০), জরিনা আখতার (৫১), বিমল গুহ (৫২), নাসির আহমেদ (৫২), মুজিবুল হক কবীর (৫২), ইকবাল হাসান (৫২), মাহবুব হাসান (৫৪), হাসান হাফিজ (৫৫), ইকবাল আজিজ (৫৫), তুষার দত্ত (৫৯), সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল (৫৮) প্রমুখ।
৩. সামাজিক অবক্ষয় ও হতাশা দীপ্ত উচচারণে প্রতিধবনিত হয়েছে যাঁদের কবিতায়, তাঁরা হলেন - সৈয়দ হায়দার (১৯৫০), শহিদুজ্জামান ফিরোজ (৫০), আবিদ আজাদ (৫২), মাহবুব বারী (৫২), মাসুদুজ্জামান (৫২), ত্রিবিদ দস্তিদ ার (৫২), মাহমুদ শফিক (৫৪), আবসার হাবীব (৫৫), আশরাফ আহমদ (৫৫), কাজলেন্দু দে (৫৬), আবদুল হাই শিকদার ( ), নাসিমা সুলতানা (৫৭), হোসেন সোহরাব (৫৮) প্রমুখ।

সত্তরের কবিদের প্রায় সকলেরই একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ধবংস, অসুন্দর, প্রেম-অপ্রেমের টানাপোড়েন, সাহসী প্রত্যয় কিংবা জীবন যন্ত্রণা এসবই সত্তরে কবিতার প্রাণ । সময়ের কারণে রাজনীতিও অনিবার্যভাবে এসেছে তাঁদের কবিত ায়। এক্ষেত্রে কবিরা কবিতার শিল্পকেও সমধিক গুত্ব দিয়েছেন।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মানুষ যখন শোকে পাথর - তখন আত্মপ্রত্যয়ী কবি আতাহারা খান চোখকান বুজে বসে থাকার পক্ষপাতী নন। তিনি সমাজকে নাড়া দেওয়ার আহ্বান করেন - 'পাথর হয়ে থমকে গেলেন দেখি/ধাক্কা দেবো - ধাক্কা দেবে া নাকি /... ধাক্কা খেয়ে ধাক্কা দিতে থাকেন!' তাঁর প্রত্যাশার মধ্যে চেতনা ফিরে আসবে একদিন।
অবিদ আনোয়ার জংধরা সমাজের দুরবস্থায় প্রতিবাদী কণ্ঠ। তিনি দুঃখ শোকে হতবিহ্বল মানুষের জন্য জিয়ন কাঠিরও সন্ধান করেন পাশাপাশি। 'দেয়াল ফেটে রক্ত ঝরে জং ধরেছে কাঁচে/ক্লান্ত চড়ুই নিজের পাখা নিজেই ছিঁড়ে ক্ষোভে/গে ারের গানে তৃপ্তি খোঁজে নতুন কোন র‍্যাঁবো/এই বাড়িতে জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে কখন দেবো।'

শিহাব সরকারের কবিতায় ধবংসের মধ্যেও আশাবাদ উচচরিত হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ধবংসের মধ্যে নতুনের জন্ম। অসুন্দরের বিনাশের মাধ্যমেই সুন্দরের আহ্বান করেছেন তিনি - 'এ্যাম্বশ পেতে কালো পদধবনির দীর্ঘ তৃষ্ণায়/গ্রেনেড হ াতে ও বসে ছিলো ঝড়ঝঞ্ঝা খরার ভেতর/একদিন বিস্ফোরণ ছিলো যুবকের মাতৃভাষা।' একই কবিতায় তাঁর বিশ্বাসী প্রত্যয় আরো মূর্ত হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন - 'ধবংসস্তূপের ওপর পুঁতে আসবে উজ্জীবনের সবুজ পতাকা/যুবকের হ াতে রাজদন্ড যুদ্ধের পরে / যুবক শাসন করবে পৃথিবী'।

স্বাধীনতার পর মানুষের মূল্যবোধ বদলিয়েছে, সর্বত্রই লোপ পেয়ে বসেছে মানুষের মূল্যায়ণ ক্ষমতা। রাতারাতি মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনও হয়ে যায়। এসব দেখে দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে রূদ্র মহম্মদ শহিদুল্লাহ উচচারণ করেন - 'পচা ডোবা তাকে যদি বলো, বলো যদি জলাশয় তাকে/ওই যে উথাল নদী, কি নামে ডাকবে তাকে দেবে কোন নাম' এই অবস্থার মধ্যেও কবি বিচলিত নন। তাঁর বিশ্বাস-প্রকৃত মানুষ একদিন গুণীকে চিনতে পারবেই। সমাজে যারা অবহেলিত - সেই কৃষক শ্রমিক যাদের ঘামে উৎপাদিত হয় আমাদের দৈনিক আহার - তাদেরও প্রকৃত পরিচয় মাটিতেই মিশে রয়েছে। তিনি বলেন - চাষ াটার ঘর ওই, ওখানে ক্ষেত-মাঠ চেনে ওর ঘাম, /কি নামে ডাকবে ওকে ওর নাম লেখে মাটি আষাঢ়ের পাঁকে।

জাহিদ হায়দারের কবিতায় সামাজিক স্বচ্ছ। তাঁর কথা বলার ভঙ্গি ঋজু, কিন্তু কবিতায় বলার ভঙ্গি সবসময় ঋজু নয়। তিনি তির্যক বাণীভঙ্গিতে বক্তব্যকে তীক্ষ্নভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম। জাহিদ হায়দার যখন বলেন - 'বলো, কে যাচ্ছো/ উত্তর দিচ্ছো না কেন / বাতাস আমাকে বলে, / বোধহয় মানুষ/ না-হলে উত্তর পাওয়া যেত।' অন্যত্র কবি তাঁর নিজের কষ্টের কথা বলেছেন কবিতার রূপকের মাধ্যমে - 'কবিতাটি কষ্টে আছে খুব/অবহেলায় কণভাবে'। কবির এই কষ্ট যেন সম

াজের সর্বত্রই বিরাজমান।

সমাজের অবক্ষয়ের মাঝেও মোহন রায়হান অত্যন্ত আশাবাদী কণ্ঠ। তিনি যখন বলেন - 'একদিন সব মেঘ চিরে/রোদ উঠবে আকাশে;' তখন আমরা ক্ষণিকের জন্যে হলেও স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারি।

মাতৃভূমির গৌরব ও সম্মান রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ কবি শিশির দত্ত বলেন - 'আমি বলতে চাই/ আমার মাতৃভূমি আমার মতো একা নয়।'

কবিরাও শ্রমিক, বিপ্লবী-শ্রমিক, বিপ্লবের সহযোদ্ধা - এককথায় সমাজের প্রবক্তা। আবার কবিরা প্রেমিকও। আধুনিক কবি কল্পনার মনোজগতে বিচরণ করেন না, তাঁরা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে উজ্জীবিত। তাই আধুনিক কবিতায় প্রেম ও রাজনীতি সমান্তর াল হেঁটেছে। স্বপন দত্ত যখন বলেন - 'কিছুই বুঝি না আমি অশোকার কিছুই বুঝি না!/বিপ্লবী শ্রমিক নই আমি কিন্তু বিপ্লবের সহযোগী শক্তিদাতা কৃষকও যে নই,/শুধুমাত্র অবক্ষয় কীটদীর্ণ মধ্যবিত্ত পিতার সন্তান,/আমি যদি কণ্ঠ খুলে করি সত্য আত্মউচচারণ, আমার দুহাতে রজ্জু,/নির্মম হিটলার যেনো দৃঢ়ভাবে করে আলিঙ্গন।' এই উচচারণ নিছক প্রেমের উচচারণ নয়। এখানে প্রেম ও সমাজের অবক্ষয়, সামাজিক অনাচার বলিষ্ঠ ভঙ্গি তে উচচারিত হয়েছে।

কবিতাকে সবকিছুর পরে কবিতা-ই হয়ে উঠতে হবে। কবিতার শিল্প সম্পর্কে সচেতন ময়ুখ চৌধুরীর কবিতা পড়তে পাঠক বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বক্তব্য প্রকাশে উপমা ব্যবহারের ব্যক্তিগত কৌশলের জন্যে ময়ুখের কবিতাও যেন অনেক সময় স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে - 'নদীতে জোয়ার এলো, জোয়ার এসে বলে গেলো সমূহ-সংবাদ ঃ/সেখানে জলের বুকে মৃদঙ্গের ঢেউ উছলায়,/ স্পর্শে যুবতীর শরীরের মতো কাঁপে জল, জলের চেতনা।' বর্তমান সমাজের খুঁটিনাটি সচেতন ভঙ্গিতে উঠে আসে ময়ুখ চৌধুরীর কবিতায়।
নাসির আহমেদ কবিতা লেখেন মনের গভীর অনুভূতি থেকে। নদীর কল্লোল, ধাবমান বহুবর্ণ হরিণের গতিই নাসিরের অ াদর্শ। তাঁর কবিতায় প্রেম যেন একটি অনিবার্য এবং কাময় প্রাসাদ, যার অভাব কবির জন্য ধূধূ বালিয়াড়ি। 'এই স্থবিরতা, এই শস্যহীন; বিরাট প্রান্তরে/খুঁজো না আমাকে.../ক্ষিপ্রগতি ধাবমান হরিণ জানে আমার ঠিকানা'। নাসির আহমেদের হ াতে নিপুণ বেজে ওঠে প্রেমের পংক্তিমালা। প্রেমের অনুষঙ্গে সামাজিক দুরবস্থার কথাও নাসির সাবলীলভাবে তুলে অ ানেন - 'জীবন এখন সেই অনাহারী কৃষকের মতো/তৃষিত পদ্মার হাহাকারে যার পলিময় জমি আজ ধূধূ বালিয়া ড়ি/বিরহের নাম তাই ঘাতক ফারাক্কা!'

সত্তরের কবিরা বিজয়ের গান শুনতে চান। বিজয় শুধু ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বিজয় বলতে কবিরা অন্য ায়ের বিদ্ধে ন্যায়ের, অসত্যের বিদ্ধে সত্যের, অকল্যাণের বিদ্ধে কল্যাণের বিজয়কেই বুঝিয়েছেন। বিজয়ের সপক্ষে মাহবুব হাসানের উচচারণ- 'আমি শুধু বিজয়ের কথা বলি/আন্দোলিত শস্যক্ষেতে সৌরভ শিশিরে দেখি বিজয়ের গান'।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বাতাস গোলাগুলি, বোমা-বাদের গন্ধে ভারী ছিলো দীর্ঘদিন। ও ঘোর কাটাতে অনেক সময় লেগেছে আমাদের। বাংলার মানুষের সাথে কবিরাও বাদের গন্ধমিশ্রিত বায়ুতেই নিশ্বাস নিয়েছেন। তাই সত্তর দশকের কবির পক্ষেই সম্ভব ছিলো বাদ ও ভালোবাসাকে পাশাপাশি উচচারণ করা। হাসান হাফিজ ভালোবাসার ছলচাতুরীকে অগ্রাহ্য করে হুঁশিয়ারী উচচারণ করে বলেন - 'ভালোবাসা-বাদের ছোঁয়া পেলে/জ্বলে ওঠে দাউ দাউ।' হাসানের কবিত ায় সমাজের, জাগতিক পৃথিবীর সবকিছু অবলীলায় উঠে আসে - 'কখনো ঝিলিক দেয় দ্যুতি/তেজস্বি ররি বিকিরণ/ স্ব াস্থ্যকর ভোরের বাতাস/দুটি স্নিগ্ধ হাতের মমতা/চিরায়ত উদ্ধত মিছিল'।

ইকবাল আজিজ সমাজের অবস্থা দেখে দুঃখিত হন, পরিবর্তন চান সমাজব্যবস্থার। তিনি বলেন - 'হলুদ দুঃস্বপ্নের মতো ও

কোন জীবন আমি বেছে নিলাম / মুক্তি চাই প্রভু মুক্তি চাই'।

তুষার দাস সামাজিক অবস্থায় বিচলিত হন না। তিনি সামাজিক অঙ্গীকারে নিজে তৈরী করে তোলেন - 'একেকটি মানুষ এসে প্রতিদিন আমাকে বাড়িয়ে দিয়ে যায়/ তাদের বিমুগ্ধ চোখ, অভিজ্ঞতা, ভালোবাসা আমাকেও তৈরী করে/অঙ্গীকারে বেঁধে ফেলে সারাটি জীবন'

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল সামাজিক অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদী। তিনি ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপনের প্রতিবাদ করেন, এর অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চান - ও অবস্থা থেকে সমাজের মুক্তি কামনা করেন - 'আমাকে শাসায় শকুনের চোখ, অলৌকিক আঁখি/এইসব সহ্য করে বেঁচে আছি - ক্রীতদাস/প্রতিবাদহীন এই বেঁচে থাকা, এই বসবাস/থেকে ছুটি নিয়ে অবসর জীবনযাপন ভালো'।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধদগ্ধ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্ষুধা, দারিদ্র্যের কারণে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছিলো। যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এসেছিলো হতাশা। শিক্ষাঙ্গন থেকে শু করে সমাজের সর্বখানে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। এর মধ্যে দুর্ভিক্ষের ভোগান্তিতে ম ানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সামাজিক মূল্যবোধ হারায় মানুষ। সত্তর দশকের কবিদের কবিতায় নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে সেদিনগুলোর অবস্থা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে চলে যাওয়ায় সমাজের সর্বত্র হতাশার সুর বেজে ওঠে-কবিতায়ও। সেইদিনের সমাজের অবস্থার - সত্যকে সৈয়দ হায়দার তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায় - 'অক্টোপ াস শুঁড় তুলে/ধেয়ে চলে অসহায় নারী ও শিশুর পিছে পিছে/যখন সূর্যের চোখে চোখ পড়ে যায় পরিষ্কার/অথবা দুরের হিমালয়ে অথবা অজানা সত্যে/তখনি ও অভিমুখ গ্রাস করে সত্য মহাসত্য'।

শহীদুজ্জামান ফিরোজের কবিতায় জীবনের রূপ বর্ণিত হয়েছে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার বর্ণনার মাধ্যমে - 'জীবনটা কি মস্ত বড় হাঁ/খুব গোপনে ... বেড়ে ওঠা /... জামাকাপড় এটা ওটা/জীবনটা কি অজানা এক দূরারোগ্য ঘা!'

আবিদ আজাদ সমাজের খুঁটিনাটি দেখেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। সমাজের সর্বত্র অন্যায় যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়-তখন সমাজসচেতন এই কবি অস্থির হয়ে ওঠেন। বক্তব্যে অত্যন্ত শক্তিশালী কবি আ বিদ আজাদ মানুষের বিচলিত অবস্থায় সমাজের নির্ঘাৎ অধঃপতন দেখতে পান - 'অধঃপতনের আন্তর্জাতিক ভাষাই কি তাহলে কবিতা? / হে কবিতা, হে অধঃপতন অন্ধকারে একা একা ফিরে যাওয়া শিখিয়ে দাও / আমাকে শিখিয়ে দাও সহিষ্ণুতা বলে দাও কোন পথে যাবো'।শ্বাসরুদ্ধকর সেই পরিস্থিতিতে সুস্থ নিশ্বাসের বাতাস যেন কোথাও নেই। মুহূর্তের স্ব স্তির জন্যও দুদন্ডশান্তি দেয়ার কাউকেও তিনি খুঁজে পান না - 'নেই কোথাও সে নারী নেই,গ্রীবানেই, বাহু নেই / টিয়া বা তিতিরপাখি নেই / যার ঠোঁটে, যাদের চঞ্চুর কাছে চিরস্থায়ী করে / রেখে যেতে পারি আমার আকুল চুম্বনের স্মৃতি। / অ াত্মঘাতী এই কালে / জীবনের শেষ চুমো আমি রেখে যাই মৃত্যুরই ঠোঁটে, লাল আলজিভে/থুতু ও ফেনায়'।

মাহবুব বারী দেখতে পান আগামী পৃথিবীর তুলকালাম যুদ্ধ - ধবংসযজ্ঞ। সমাজের প্রতি অঙ্গীকার সত্ত্বেও এই কবি যখন ভবিষ্যতের কথা বলেন, তখন তাঁকে খুব অসহায় মনে হয় - 'পৃথিবীতে মানুষ একদিন বাদ ও গন্ধকের ভেতর দিয়ে যাবে'। তিনি সেই দুরবস্থায় হতবিহ্বল কবি প্রিয়তমার আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন - 'প্রিয়তমা, এইবার তুমি পরিখা খনন করো / খন্দকের যুদ্ধের মতো'।

সামাজিক অবক্ষয়ে পীড়িত হয়ে একাকীত্ব কামনা করেছেন কবি মাসুদুজ্জামান। সমাজের এ অবস্থা তাঁর একার মধ্যে সীম াবদ্ধ থাকার নয়, যদিও কবি নিজের মধ্যেই উচচারণ করে ওঠেন - 'নিজেকেই বলি শোনো, মানুষের মূঢ়তায় / করতল জুড়ে আসমুদ্রহিমাচল শুয়ে থাকো / একা, রিক্ত বিবসনা, পত্রহীন'।

ত্রিদিব দস্তিদারের কবিতায় শিল্প ও প্রতিবাদ সমন্বিত হয়ে অশুভ শক্তির প্রতি ঘৃণার কথা উচ্চারিত হয়েছে। তিনি যখন বলেন - 'পোশাকের কাছে কেউ কি হয়েছে নত? - তখন হানাদার বাহিনীর রক্তাক্ত বিভীষিকাময় পোশাকের কথা আম াদের চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে। ত্রিদিব মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে কখনো আপন করে নিতে প্রস্তুত নন। কোনো প্রলে াভনে তিনি অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অশুভ চক্রের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে রাজী নন - 'তারা যদি আসে রক্তের দাগ মুছে / তবু কি তারা চুমুর চিহ্ পাবে? / .....বিষ পিঁপড়ে ছুটবে তাদের ক্ষতে'।

সামাজিক সংঘাতে, অবক্ষয়ে ও অবসাদে মাহমুদ শফিক বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর হৃদয় সমাজের যে কোন স্খলন দেখে জ্বলে ওঠে - 'অমৃতের মাঝে ঝরে শুধু হেমলক / অনাব্যবোধ, সংঘাত, অবসাদে / পৃথিবীর বুকে পেরেকের মতো শুধু / বিদ্ধ আমি যে কি এক আর্তনাদে'।

কাজলেন্দু দে-র কবিতায় উচ্চারিত হয় দিকচিহ্হীন এক অবস্থানের - 'দিবস-রজনী শুধু কক্ষচ্যুত উল্কার মতন / কোনদিকে ভেসে যাবে, কতদূর, আর কতকাল?'

নাসিমা সুলতানার কবিতায় মূল্যবোধের অবক্ষয় নিপুণভাবে ফুটে ওঠে। তিনি লুকানো মানুষের চেহারা সহজেই চিনে নিতে পারেন - 'অথচ মানুষ দেখো জীবনের মধ্যে জীবন বদল করে / কেমন ভীষণভাবে বেঁচে যায় /..... ফুসফুসের ভেতর থেকে অন্য এক ফুসফুস নিয়ে / একটা মানুষ থেকে বেরিয়ে আসে অন্য এক লুকানো মানুষ'।

সমাজের বিমর্ষ অবস্থা হোসেন সোহরাব-কে পীড়িত করে। সমাজের মানুষের অবস্থানের কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন - 'এখন পায়ের নিচে মাটি নেই শুধুই শূন্যতা /..... আমার আড়ালে তুমি শব্দহীন উজ্জ্বল ছবির আলোড়ন'। ঘুণে ধরা এই সমাজের স্থিতি নিয়ে সন্দিহান সোহরাব অবশেষে বলে ওঠেন - 'দূরের দিগন্ত ভালো নিকটের শত্রুতার চেয়ে'। সমাজের সকল প্রতিবন্ধকতাই যেন কবির কাছে সাক্ষাৎ শত্রুর সমতুল।

সত্তর দশক বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রে গুত্বপূর্ণ দশক। এই দশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে কবিদের সাথে প াঠকের দূরত্ব অনেক কমে এসেছে। রাজধানী কেন্দ্রিক কাব্যচর্চা সম্প্রসারিত হয়েছে সারাদেশে। রাজধানী ছাড়াও দেশের প্রধান প্রধান শহর চট্টগ্রাম, যশোর, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী-তে শু হয় কবিতা চর্চা - গড়ে ওঠে কবিগোষ্ঠী। ওছাড়া বড় বড় মহকুমা শহরেও কবিতা সম্মেলন হতে শু হয়। সত্তর দশক যেন কবিতারই দশক। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দর্শনীর বিনিময়েও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান করার প্রচলন হয়েছে। সত্তরের দশকে অনেক বেশী আদৃত হয়েছে কবিতা - সামাজিক মর্যাদাও অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে কবিদের।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com